বহরাগড়া

সন্ধ্যায় এসে আমরা বহরাগড়া ডাকবাংলোতে পৌঁছে গেলাম। চমৎকার মুক্ত স্থান। ডাকবাংলোর অদূরে একটা কালো পাথরের পাহাড়। পাহাড়টির চেহারা দেখে মনে হয় বড় একটা কালো মাকড়সা মাঠের মধ্যে চুপ করে বসে আছে। আমার সঙ্গে ছিলেন ফরেস্ট অফিসার মি. সিংহ। তিনি এ অঞ্চলে অনেকবার এসেচেন—এখানকার সব জায়গা চেনেন।

মি. সিংহ পরদিন মোটরে আমাকে নিয়ে দুধকুণ্ডী রিজার্ভ ফরেস্ট বেড়াতে গেলেন। দুধকুণ্ডী সর্ডিহা থেকে ময়ূরভঞ্জ পর্যন্ত যে রাস্তা গিয়েছে, ওরই ধারে। এই রাস্তার নাম বম্বে রোড কেন হল একথা বলা শক্ত। কারণ বম্বের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ময়ূরভঞ্জ পর্যন্ত গিয়ে কোনো পাহাড় জঙ্গলে নিভৃতে মিলিয়ে গিয়েচে এ রাস্তা।

পথে দুপাশে বহুদূর বিস্তৃত ধানের ক্ষেত—বৃষ্টিধৌত নীল আকাশের তলায় সুন্দর ছবি এঁকে রেখেচে যেন। নিকটেই মানস মুড়িয়া বলে একটি বড় গ্রাম আছে। এখানকার অধিবাসীরা সবই বাঙালি, বাংলা কথা বলে—কিন্তু উড়িয়া ভাষা মিশানো বাংলা। এই গ্রামে চালের ব্যবসার একটা বড় কেন্দ্র। সিংভূমের মধ্যে সকলের চেয়ে সস্তা চাল এখানে পাওয়া যায়। এই দুর্দিনেও টাকায় তিন সের পুরনো চাল বিক্রি হতে দেখেছি এখানকার হাটেবাজারে।

ধানের ক্ষেত রাস্তার দুধারেই। সবুজের বিশাল সমুদ্র যেন পার হয়ে চলেচি। সরু বম্বে রোড এই সবুজের সাগরের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেচে যেন। এত বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত যেখানে, সেখানেও অন্নাভাব কেন তাই ভাবি। কারণ বহরাগড়া ডাকবাংলোতে দেখেচি দলে দলে জীর্ণশীর্ণ ভিক্ষুকের দল আসচে। বহরাগড়া স্কুলের বোর্ডিং-এ ভাতের ফ্যান পাবার আশায় একদল শীর্ণ বালক-বালিকা সেখানে সকাল থেকে বসে থাকে।

পথে আর একটা বড় গ্রাম পড়লো। এটাও আধা উড়িয়া আধা বাঙালি গ্রাম—ঘরগুলি অধিকাংশই মাটির। জানালার বালাই নেই এ সব ঘরে। রাস্তার ধারে দু-একটা ময়রার দোকানে তেলেভাজা জিনিস ও কুচো গজা কলঙ্কধরা পেতলের থালায় সাজানো। দিনরাত রাঙা ধুলো পড়চে খাবারগুলোর ওপরে। শুনলাম এ গ্রামে একটা হাই স্কুল খুলবার চেষ্টা হচ্চে। সিংভূমের অনেকগুলি কংগ্রেসকর্মীর নিবাস এই গ্রামে।

এইবার পথের দুপাশে বড় বড় লতার জঙ্গল শুরু হল। এই মোটা মোটা লতাগুলি সুন্দর সবুজ ঝোপ সৃষ্টি করেচে—এর ডাঁটায় এদেশে নাকি ঝুড়ি বোনা হয়। এর স্থানীয় নাম কাউরা লতা—বৈজ্ঞানিক নাম Combritum Decandrum মি. সিংহের মুখে শুনলাম। আষাঢ় মাসে কাউরা লতায় চমৎকার হলদে রং-এর ফুল ফোটে—তখন এই অঞ্চলের ভূমিভাগের বড় শোভা হয়। শুধু এই লতার ঝোপ ছাড়া অন্য কিছু দেখা যায় না পথের দুধারে—হয়তো মাঝে মাঝে দু-একটা মৌল কি অর্জুন গাছ। কি একটা গাছে বড় সুগন্ধি ফুল ফুটে আছে, কিন্তু গাছটার নাম জানা গেল না।

দুধকুণ্ডী একটা ক্ষুদ্র উড়িয়া বস্তি। ময়ূরভঞ্জের সীমানা থেকে সতেরো-আঠারো মাইল দূরে। আমরা রিজার্ভ ফরেস্টের প্রান্তবর্তী একটা ঘাটোয়ালি বাংলোতে উঠলাম। স্থানীয় জমিদারকে এ অঞ্চলে ঘাটোয়াল বলে। আইন অনুসারে স্থানীয় ঘাটোয়াল গবর্নমেন্টের কর্মচারীগণের ব্যবহারের জন্যে একটা বাংলো রাখতে বাধ্য। তাকেই বলে ঘাটোয়ালি বাংলো—মাটির দেওয়াল, খড়ের চালা। গত বর্ষায় জল পড়ে মাটির দেওয়াল অনেক স্থানে গলে গিয়েচে। আসবাবের মধ্যে দু-খানা দড়ির চারপাই, একটা কাঠের চেয়ার ও বড় একটা টেবিল। কাঠের আসবাবগুলি মান্ধাতার আমলের। পালিশের সম্পর্ক নেই কোনোটাতে।

যা হোক, এই বন্য অঞ্চলে একটু মাথা গুঁজবার জায়গা পেয়ে আমরা সেই অজ্ঞাতনামা ঘাটোয়াল মশায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলাম। এই জঙ্গলে কে একটু আশ্রয় দেয়? দু-জন লোক সেখানে বসে ছিল—তারা মোটর থেকে আমাদের নামতে দেখে শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে অভিভূত হয়ে পড়লো। ছিল দিব্যি বসে, হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে অকারণে হাত জোড় করে রইল আমাদের সামনে। আমরা বললাম—চৌকিদার কোথায়?

—হুজুর, আনচি ডেকে।

—জলদি করো—

একটু পরে চৌকিদার এল। তার কথা বুঝতে পারা সে এক ব্যাপার। কেউ বুঝতে পারে না—আমি তো একেবারেই কিছু বুঝি না। তাকে জিজ্ঞেস করা হল সে চায়ের কোনো জোগাড় করতে পারে কি? তাতে সে বল্লে, সে অসম্ভব।

চায়ের আশা আমরা ছেড়ে দিলাম। একজন গ্রাম্য লোক সেখানে বসে আছে, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তোদের এখানে চালের দর কি?

—তিন সের করে টাকায়, বাবু। লোক না খেয়ে মরে যাচ্ছে।

—মাছ পাওয়া যায়?

—এই জঙ্গলে ও সব মেলে না।

—তোরা কি খাস্?

—শুধু ভাত আর শাক। চিরকালই আমরা এই খাই। এর বেশি জোটে না।

চৌকিদার বললে—বাবু, নিকটে খাড়ামৌদা বলে একটা গাঁয়ে অনেক কাঁসারির বাস ছিল। তারা কাঁসার বাটি তৈরি করে মেদিনীপুরের মহাজনদের কাছে বিক্রি করতো। এই আকাল পড়বার পর থেকে তাদের জিনিস কেউ কেনে না। কাঁসারিরা না খেয়ে মরচে। তাদের একটা পয়সা আর নেই, অথচ অনেক ছেলেপুলে ওদের বাড়িতে।

সামনেই বম্বে রোড। ঘাটোয়ালি বাংলোতে মোটর দেখে অনেকগুলি পথ-চলতি গ্রাম্য লোক এসে সেখানে দাঁড়ালো। তাদের মধ্যে মেদিনীপুর অঞ্চলের দু-একজন লোক ছিল, ওরা সর্ডিহা থেকে ময়ূরভঞ্জ যাচ্চে জীবিকা অন্বেষণে। তাদের মুখে শুনলাম মেদিনীপুর জেলার অবস্থা। পথের ধারে মানুষ নির্জীব অবস্থায় পড়ে আছে, এ প্রায়ই দেখা যায়। তবুও আমি বলচি এ ভাদ্রমাসের শেষের সপ্তাহের কথা। অবস্থা তারপর আরো গুরুতর আকার ধারণ করেচে।

এই সময় বৃষ্টি আসাতে লোকগুলিকে আমরা ডেকে বাংলোর বারান্দাতে বসালুম। যে ময়ূরভঞ্জ যাচ্ছিল তাকে বললুম—তোর বাড়িতে ক-জন খেতে?

—সাতজন, বাবু।

—জমি আছে?

—আমরা মজুর, ক্ষেতে কাজ করে খাই। আমাদের দেশে এক বিঘে জমির দাম আড়াইশো টাকা। জমি কিনবার ক্ষমতা কি আমাদের আছে বাবু?

—ময়ূরভঞ্জে কেন যাচ্চ?

—এই সময়ে ওখানে নতুন ধান উঠেচে, সস্তা চাল। আমাদের জেলায় চাল গাঁয়ের হাটে মোটেই আসচে না। ওখানে গেলে দুটো খেতে পাবো।

—আর বাড়িতে যে লোকগুলো রইল তারা কি খাবে?

—পনেরো দিন পরে তাদের জন্যে বাঁকে ঝুলিয়ে আধমণ ত্রিশসের চাল জোগাড় করে আনবো।

বৃষ্টি একটু পরে থেমে যেতে লোকগুলো চলে গেল। মি. সিংহ জঙ্গল তদারকে বার হলেন। আমি আর আমার স্ত্রী রইলাম বাংলোতে। রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ' ছিল তার সঙ্গে, তিনি দড়ির চারপাইতে শুয়ে বই পড়তে লাগলেন। আমি কিছু লিখবো ভেবে জানালার ধারের টেবিলটাতে ভর দিয়ে ভাঙা কাঠের চেয়ারাখানাতে বসলুম। অপূর্ব বনভূমির শোভা। জানালা থেকে দশ বারো হাত দূর থেকে রিজার্ভ ফরেস্ট আরম্ভ হয়েচে, গত বর্ষার বারিধারায় নবীন, সতেজ, ঘনশ্যাম। কত কি গাছপালার শীর্ষদেশ চোখে পড়চে জানালা দিয়ে, কত কি পাখি ডাকচে। বৃষ্টিধৌত সুনীল আকাশের তলায় যতদূর দৃষ্টি যায়, বন আর বন। এ ঘরটি যেন ঋষির আশ্রমের মতো নির্জন, সারাদিনে একটি লোকেরও যাতায়াত নেই, জানালার ধারে বসে নিঃসঙ্গ নির্জনতার মধ্যে বই পড়ো, লেখো, চিন্তা করো। মন আপনিই ধ্যানোন্মুখ হয়ে ওঠে এই শালকাঠের আড়া-খুঁটি লাগানো সেকেলে ধরনের খড়ের ঘরের মধ্যে উইধরা কাঠের গরাদেওয়ালা জানালার কাছে বসলে। এমন একটি স্থান, এমন একটি ঘরের সন্ধান মেলে বহু ভাগ্যে।

মোটরের ড্রাইভার এই সময়ে অনেকগুলি অজানা বন্যফুল বন থেকে সংগ্রহ করে এনে আমার স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললে—দেখুন মাইজি, কেমন চমৎকার ফুল!

বন্য ক্যানাজাতীয় একরকমের ফুল তার মধ্যে সত্যিই এত সুন্দর! আর একধরনের বুনো বাংলার ফুল ঠিক যেন ছোট ছেলেদের পশমের টুপির ঘুণ্টির মতো। খুব বড় ও হলদে রং-এর আর একজাতীয় ফুল দেখতে অনেকটা সূর্যমুখীর মতো। কোনো ফুলেই অবিশ্যি গন্ধ নেই। বনের মধ্যে আমরা কিছুদূর বেড়িয়ে এলুম। বৃষ্টিস্নাত বন্য অ্যাকেসিয়ার মাথায় পশমের টুপির ঘুণ্টির মতো অজস্র ফুলের ভার। মাটিতে সর্বত্র লজ্জাবতী লতা—তাতে ছোট ছোট ফুল ফুটেচে। বনের মধ্যে দিয়ে অন্য গ্রামে যাবার সরু পায়ে-চলা পথ। বনে খুব বড় বড় গাছ নেই, সবই শাল-চারা ও ক্বচিৎ দু-একটা বড় বট কি মহুয়া গাছ। দৈর্ঘ্যে মাইল দুই কি সামান্য কিছু বেশি হবে—কিন্তু এই বনেই শুনলাম ভাল্লুক ও নেকড়ে বাঘের বেশ উপদ্রব আছে।

২

বহরাগড়া ডাকবাংলো থেকে মাইল কয়েক দূরে একটি পাহাড় আছে, এর নাম শিরবাই পাহাড়। সিংভূমের এ অঞ্চলের মধ্যে এই পাহাড়েই উৎকৃষ্ট জাতীয় কাইনাইট পাওয়া যায়। যখনই আমরা কেশুরদা গ্রামের পাশ দিয়ে মোটরে গিয়েচি কেশুরদার বিখ্যাত বাঁশবন বেড়াতে, তখনই দূর থেকে শিরবাই পাহাড়ের দৃশ্য আমার মনকে মুগ্ধ করেচে। রোদ পড়ে পাহাড়টা যেন ঝকঝক করচে মনে হয়।

কেশুরদার এই বাঁশবন এদিকের মধ্যে একটি দ্রষ্টব্য স্থান। প্রায় দুশো বিঘে জমির উপর শুধু বাঁশের চাষ করা হয়েছে বনবিভাগ থেকে। বাঁশ বড় বড় হয়ে ঝাড় বেঁধেচে, গরু বাছুরে পাছে ঢুকে নষ্ট করে তার জন্যে বড় খানা কাটা আছে বাঁশবনের চারিপাশে, একটি লোহা ও কাঠের ঝাঁপ আছে এক জায়গায়, এই ঝাঁপ খুলে বাঁশবাগানের মধ্যে যেতে হয়। বসন্তের শেষে যখন বাঁশপাতা ঝরে বাঁশতলা বিছিয়ে থাকে, তখন এই বাঁশবনের মধ্যে শুকনো পাতার রাশির উপর শুয়ে অদূরবর্তী শিরবাই পাহাড়ের দিকে চেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়, মনে যেন এক অপূর্ব আনন্দ আসে।

এই বাঁশবনের বাঁশগাছে কয়েকবার ফুল ধরেছিল, বনবিভাগের কাগজপত্রে তার উল্লেখ আছে। শুধু এখানে নয়, সারান্ডা অরণ্যের বাঁশবনেও ১৯২১ সালে প্রথম ফুল দেখা যায়, পরে পাঁচ-ছ বছর অন্তর অন্তর কয়েকবার বাঁশের ফুল ফোটে। বলা আবশ্যক যে বাঁশগাছের ফুল গোলাপ যুঁই ইত্যাদির মতো নয়, ঘাসের ফুলের মতো শিষ হয় এবং শিষের গায়ে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল ধানের মঞ্জরীর মতো দেখায়।

একজন বনবিভাগের হো জাতীয় কর্মচারীকে আমি বাঁশের ফুলের কথা জিজ্ঞেস করি। লোকটি হো খ্রিস্টান, নাম সুলেজান কারকাট্টা—মনোহরপুর বেন্‌জের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। সে বললে—বাঁশের ফুল, ও আমরা অনেক দেখেচি। আমি বললাম কি করে দেখলে? তোমাদের খাতাপত্রে লিখচে বাঁশের ফুল খুব সুলভদর্শন জিনিস নয়। কালেভদ্রে হয়।

—ও সব হচ্চে কেতাবের কথা। আমাদের হাতে বড় বড় পাহাড়ি বাঁশের বনের ভার। কতবার ফুল দেখেচি বাঁশগাছে।

—কি রকম দেখতে?

—শিষ হয় ধানগাছের মতো, ফুলটুল বলে বোঝা যায় না, শিষের মধ্যেই ছোট ছোট বীচির মতো থাকে তারই নাম ফুল।

এবার ভাদ্রমাসে কেশুরদা বাঁশবন দেখতে গিয়েছিলাম। তখনো বাঁশবনের তলা পরিষ্কার হয়নি। সর্বত্র আগাছার জঙ্গল ও একপ্রকারের উলুখড়ের মতো ঘাস, তার আগায় প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা শুঁয়ো আদি, কাপড়ে লাগলে আর ছাড়তে চায় না। বাঁশপাতা ঝরতে আরম্ভ না হলে বাঁশবনের শোভা হয় না, বাঁশবন দেখতে হলে চৈত্র মাস বৈশাখ মাস। এত বড় বাঁশের বন তো এমনি কোথাও দেখা যায় না, কাজেই যাঁরা বাঁশবনের শোভা ভূমার মাপে অনুভব করতে চান, তাঁদের এখানে একবার আসা কর্তব্য।

শিরবাই পাহাড় সুবর্ণরেখার তীরে অবস্থিত, বাঁশবন থেকে মাইল দুই দূরে হবে, কিন্তু দেখায় যেন খুব নিকটে। কেশুরদা গ্রামে আর কিছু বিশেষ দেখবার নেই, একটি মন্দির ছাড়া। স্থানীয় এক অবস্থাপন্ন গৃহস্থ এই মন্দিরটি করে দিয়েচে, দরজায় লেখা আছে "শ্রী শ্রী "স্বর্গবাউড়ি মাতার মন্দির"। "স্বর্গবাউড়ি"শব্দের অর্থ কি তা গ্রামের লোকের কাছে জিজ্ঞেস করেও পাইনি।

এবার আমি মন্দির দেখচি, সঙ্গে আমার স্ত্রী আছেন—একটি উড়িয়া ব্রাহ্মণ ফুলের সাজি হাতে নিয়ে মন্দিরে ঢুকলেন। তিনিই আমাদের মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরের মূর্তি দেখালেন। মাকড়া পাথরে তৈরি মূর্তি, কিন্তু পাথরের লালচে রং এখন একটু কালো হয়ে গিয়েচে। হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত পরিচিত কোনো দেবীমূর্তির সঙ্গেই সেটির গঠন ও আকৃতি মেলে না, পূজারি ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করেও স্বর্গবাউড়ি দেবীর কুলজী উদ্ধার করতে পারিনি।

পুজারি ঠাকুরের মুখে শুনলাম অনেক প্রাচীন দিন থেকে এইস্থানে দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। পূর্বেকার মন্দিরটি তাদের জন্মগ্রহণের পূর্বে ভেঙে গিয়েছিল, ঠাকুর পড়ে থাকতেন পথের ধারে গাছতলায়। প্রায় পঞ্চাশ বছর এই অবস্থায় থাকবার পরে সম্প্রতি আজ পাঁচ ছ'বছর হল দেবী নতুন মন্দিরে উঠে এসেচেন।

উড়িয়া ব্রাহ্মণটিকে আমি কিছু প্রণামী দিতে উদ্যত হলে তা তিনি নিতে চাইলেন না। জিভ কেটে বললেন—আমার এ ব্যবসা নয়, দেবীর কৃপায় আমার কিছুর অভাব নেই। জীবিকার জন্যে ঠাকুর পুজো করি না, তবে পুরুষানুক্রমে আমাদের বংশই এ গ্রামে স্বর্গবাউড়ির পূজারি।

—আপনার এখানেই বাড়ি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, চলুন না আমাদের বাড়ি। মাকে নিয়ে চলুন।

পূজারি ঠাকুর আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। মাটির ঘর, বিচালির ছাউনি—মাটির পাঁচিল দিয়ে বাড়ির চারিদিকে ঘেরা। আমি বাইরের ঘরে বসে রইলাম, আমার স্ত্রী বাড়ির মধ্যে গেলেন। ছোট্ট ঘরটা বাইরের, একটা পুরোনো আমলের হাতলভাঙা চেয়ার আর দুখানা দড়ির খাটিয়া একমাত্র আসবার। দেওয়ালে মহাত্মা গান্ধীর একটা সস্তা ছবি।

একটু পরে দেখি অনেকগুলি কঙ্কালসার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বাইরের ঘরের সামনে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েচে। সংখ্যায় কুড়ি-বাইশটি হবে। ওদের হাতে এক একটা বেতের খুঁচি, কারো বা একটা তোবড়ানো বিস্কুটের টিন।

বললাম—এরা কি জাত? এ গাঁয়ে তো অবস্থা সকলেরই একরকম ভালো দেখচি, তবে এরা কে? পূজারির নাম বিশ্বনাথ পাণ্ডা। তিনি বললেন—এদের জমিজমা নেই, এরা জাতে ডোম। এবার দু'সের করে চাল টাকায় হওয়াতে এদের বাপ-মা আর খেতে দিতে পারে না এদের। মজুর খাটানোর লোক নেই। সুতরাং এরা লোকের বাড়ি চেয়েচিন্তে যা কিছু পায়, তাই দিয়ে পেট ভরায়। কিন্তু ওদের দেখে আমার মনে হল এ ভাবে বেশিদিন ওরা পেট ভরাতে পারবে না। দিন ওদের ফুরিয়ে এসেচে। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ভিক্ষে করবার শক্তি আর ওই-সব কঙ্কালসার ক্ষুদ্র দেহে কদিন থাকবে?

বিশ্বনাথ পাণ্ডা এক ধামা মুড়ি বাড়ির মধ্যে থেকে এনে প্রত্যেককে দু'মুঠো করে মুড়ি দিলেন, তা দিতেই মুড়ির ধামা ফুরিয়ে গেল। রোজ এক ধামা মুড়ি এই গরিব ছেলে-মেয়েদের মধ্যে নাকি বিতরণ করা হয়।

পরে পাণ্ডা ঠাকুর আমায় বাড়ির মধ্যে গিয়ে একটু জলখাবার খেতে বার বার অনুরোধ করলেন। আমার কৌতূহল হল বাড়ির মধ্যেটা এদের কেমন, সেটা একবার দেখতে হবে। এখানে উড়িয়ামিশ্রিত বাংলায় সকলে কথাবার্তা বলে, গ্রামের মধ্যে উড়িয়া ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি বেশি। বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে পান্ডাঠাকুর সব ঘরে আমায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালেন। ঘরের দেওয়ালের গায়ে এ কোণ থেকে ও কোণ পর্যন্ত লম্বা দু'সারি কাঠের তাক। আপিসে পুরোনো খাতাপত্র রাখবার জন্য যেমন তাক আছে তেমনি। তাকের ওপর প্রধানত কুমড়ো, লঙ্কা, সর্ষে প্রভৃতি জিনিসে ঘর বোঝাই। বেশ সম্পন্ন চাষবাসী গৃহস্থ বটে, অথচ খুব সাদাসিদে, আড়ম্বরহীন জীবনযাত্রা এঁদের। পান্ডাঠাকুর আমায় খেতে দিলেন উৎকৃষ্ট সরু ধানের চিঁড়ে, ঘন দুধ ও চিনি, এর সঙ্গে কিছু আচার। চিনি বাদে অন্য সব জিনিস তার ঘরের। এই বাজারে প্রতিদিন এক ধামা মুড়ি বিতরণ করতে দেখেই আমি বুঝেছিলাম এঁদের ধানের অভাব নেই। এখন জিজ্ঞেস করে জানলাম প্রায় পঞ্চাশ বিঘে জমিতে ধানের চাষ আছে, বাড়িতে দশ-বারোটি গরু। তাছাড়া ডাল ও তরিতরকারিও নিজেদের জমিতে উৎপন্ন হয়। এই সব গৃহস্থের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় বলেই এই দুর্দিনেও এঁদের নিজেদের তো কষ্ট নেই-ই, উপরন্তু বহু অন্নহীনকে অনুদান করেও আসচেন। আর ভূমিহীন হয়ে শুধু চাকুরির টাকার ওপর নির্ভর করার দরুন, আমরা টাকা হাতে বাজারে গিয়েও চাল কিনতে পাচ্ছি কই?

আরো বিশেষ করে কথাটা মনে হয়েছিল পুজোর আগে দেশে যাবার সময়ে।

রানাঘাট স্টেশনে আমার কামরায় দুটি ভদ্রলোক উঠলেন, তাঁদের হাতে একটা করে চটের থলে। কথায় কথায় তাঁরা বললেন, গাংনাপুরের হাটে তাঁরা চাল কিনতে যাচ্ছেন।

আমি তখনো দেশের অবস্থা ঠিকমতো জানতাম না। বললাম—কেন, ওখানে চাল সস্তা বুঝি?

—ওঁরা আমার দিকে চেয়ে বললেন—মশাইয়ের কোথায় থাকা হয়?

—আপাতত বিহারে।

—ও, তাই বাংলার অবস্থা জানেন না। রানাঘাট টাউনে তেরো হাজার লোকের বাস, আজ চারদিন সেখানে পয়সা দিলেও এক দানা চাল কিনতে পাবেন না। কোথাও নেই।

—এই চারদিন তবে লোকে খাচ্চে কি?

—ছোলা সেদ্ধ, তার সঙ্গে তরকারি, কেউ বা বজরার আটা—এইসব। পঞ্চাশ টাকা মণ দিলেও চাল পাবেন না। আজ গাংনাপুরের হাটবার, দেখি যদি সেখানে চাল পাওয়া যায়।

তখুনি আমার কেশুরদা গ্রামের বিশ্বনাথ পান্ডার সংসার মনে পড়লো। আড়ম্বরহীন চালচলন বটে, হয়তো তাদের বাড়িতে চেয়ার টেবিল আলমারি নেই, চা কেউ খায় না—কিন্তু ধানবোঝাই মরাই ও দুগ্ধবতী গাভী আছে বাড়ির আঙিনায়, দরিদ্র ছেলেমেয়েদের মধ্যে রোজ এক ধামা মুড়ি বিতরিত হয়। বাংলাদেশে মুড়ির সের এক টাকা। সে হিসেবে রোজ পাঁচ-ছ'টাকার মুড়ি বিলোয় বিশ্বনাথ পান্ডা।

জলটল খেয়ে বাইরে চলে এলাম। পান্ডাঠাকুর বললেন—দুটি ভাত খাওয়াতে বড় সাধ ছিল, কিন্তু তা সাহস করিনে।

আমি বললাম—সাহস করেন না? কি রকম?

—আমাদের খাওয়া হল অন্য রকম। বাংলাদেশে কতরকম তরকারি, মাছ, মাংস দিয়ে আপনাদের খাওয়া অভ্যেস।

—আপনারা মাছমাংস খান না?

পান্ডাঠাকুর জিভ কেটে বললেন—আজ্ঞে, কখনো না।

—তবে কি খান?

—দু'একটা তরকারি হল, ডাল হল, দুধ আছে, ঘি আছে। আমরা আলোচালের ভাত খাই, গাওয়া ঘি না দিলে খাওয়া যায় না। বাজারের ঘি কখনো আমাদের বাড়িতে ঢোকে না। ঘরের দুধ থেকে ঘি হয়।

—জলখাবার?

—চিঁড়ে-দই কিংবা ঘি দিয়ে চিড়েভাজা। মুড়িগুড়ও চলে। আখের চাষ আছে, বাড়িতেই রস জ্বাল দিয়ে গুড় করা হয়।

—আপনাদের বাড়িতে কেউ চাকুরি করে?

—কোনোদিন না। আমার দাদার দুই ছেলে, ম্যাট্রিক পাশ করেচে বহরাগড়া স্কুল থেকে, এখন বাড়িতে চাষবাস দেখে। বড়টি ময়ূরভঞ্জে জঙ্গলের মধ্যে একশো বিঘে জমি এবার ইজারা নিয়েচে।

—সেখানে কে চাষ করবে?

—সে নিজে সেখানে থাকবে। নিজে না দেখলে চাষ চলে না বাবু। খুব ভালো ধান হয়, বিঘে পিছু চোদ্দো মণ পর্যন্ত ফলে। এখানে অত হয় না। দশ মণ হয় গড়পড়তায়।

কেশুরদা থেকে ফিরে আমরা ডাকবাংলায় এলাম যখন, বেলা তখন প্রায় দুটো। আরো কিছুক্ষণ পরে প্রায় সন্ধ্যার সময় বিশ্বনাথ পান্ডা ডাকবাংলায় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। গায়ে একখানা সাদা উড়ানি, কপালে চন্দনের ফোঁটা, পাদুকাবিহীন চরণযুগল।

আমি আদর করে চেয়ারে বসালুম ওঁকে। বললাম—চা খাবেন?

পান্ডাঠাকুর হাতজোড় করে বললেন—আজ্ঞে না, মাপ করবেন। অভ্যেস নেই।

—আপনাদের গ্রামে কেউ চা খায় না?

—ও জিনিস এখনো ঢোকেনি গাঁয়ে। একজন তাঁতির ছেলে বহরাগড়া স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ দিয়ে চা খেতে শুরু করেছিল বাড়িতে। সে এখন দেশে নেই। যুদ্ধের চাকুরি নিয়ে গাঁ থেকে চলে গিয়েচে।

—জমির দাম কত?

—একনম্বর ধানের জমি দুশো টাকা বিঘে এবছর বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু তিনচার বছর আগেও পঞ্চাশ টাকা দর ছিল। এখন সবাই চাষ ধরেচে।

পান্ডাঠাকুর চলে গেলেন সন্ধ্যার একটু পরে। আমরা সুবর্ণরেখার ধারে বেড়াতে গেলাম। ওপারে ময়ূরভঞ্জের পাহাড়শ্রেণির উপর মেঘ ঝুঁকে পড়েছে, ওই শিরসা গ্রাম—সেবার এসে যেখানে বনবিভাগের কর্মচারী ভগবতীপ্রসাদ মহান্তির বাড়ি গিয়েছিলাম। এই পারঘাটের নাম কামারারা ঘাট, এখানে সুবর্ণরেখার উপরে একটা কাঠের পুল আছে, ময়ূরভঞ্জের মহারাজা এটা তৈরি করে দিয়েছেন কিন্তু বর্ষাকালে পুলটি জলমগ্ন। ওপারে বনশ্রেণির মধ্যে পুরোনো দেউলমন্দির মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, বর্ষায় কূলে কূলে ভরা সুবর্ণরেখা, সান্ধ্য আকাশে নক্ষত্ররাজি, বড় একটা শালগাছের তলায় পাথরের উপর আমরা বসে আছি।

দু'জন লোক আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালো। তারা নিকটবর্তী গ্রামের কৃষক, রাত্রে এখানে ফসলের ক্ষেত পাহারা দেয়। কিছুদিন আগে এখানে বন্যা হয়ে খুব ক্ষতি করেছে, তাই গল্প করছিল। দু'খানা গ্রামের অনেক ঘর বাড়ি একেবারে ভেসে গিয়েচে। লোকের বড় কষ্ট, অনেকে খেতে পাচ্ছে না।

আমরা বললাম—এখানে চালের দর কত?

—এখন আড়াই সের পাওয়া যায় টাকায়—সেদিনও দু'সের ছিল। অথচ এইখানেই চাল সকলের চেয়ে সস্তা ছিল ধলভূমের মধ্যে।

—ময়ূরভঞ্জে তো চাল সস্তা।

—ছ'সের করে টাকায়। আগে আনতে দিত, এখন পুলিশ বসিয়েচে ঘাটে। চাল আনবার জো নেই, তবুও কিছু কিছু আসে।

—কি ভাবে আসে?

—রাত্রে নদী পেরিয়ে আসে। কামারারা ঘাট দিয়ে আসতে পারে না। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে নারায়ণপুরের ঘাটে নদী পার হয়।

যেখানেই গিয়েচি সেখানেই অন্নকষ্টে ও ধানচাল সমস্যা সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েচে, তবুও এটা বাংলা নয়, বিহার। তবে এ কথাও ঠিক, বাংলার সীমায় অবস্থিত বলেই এ সব জায়গায় চালের এত দুর্মূল্যতা।

পরদিন বহরাগড়া স্কুলে বেড়াতে গিয়েচি; আট-দশটা ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে স্কুল-বোর্ডিঙের আশেপাশে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম—এরা কে?

হেডমাস্টার হেসে বললেন—ওরা আমাদের পোষ্য।

—কি রকম?

—এরা সকালে এসে এখানে জোটে, রান্নাঘরের নর্দমা দিয়ে যে ভাতের ফ্যান পড়ে, পাতের ভাতটাত যা থাকে বা ফেলে দেওয়া হয়—তাই খায়। আবার রাত্রেও তাই। এখানেই পড়ে থাকে সারাদিন—বেশি রাত্রে বোধ হয় বাড়ি চলে যায়, আবার অনেকে যায়ও না।

—বাপ-মা এদের আছে তো?

—আছে। কোনো খোঁজ নেয় না। ঐ দেখুন পাঁচ-ছ'বছরের একটা ছেলে রয়েছে ওদের দলে—কিন্তু কখনো দেখিনি ওর মা কি বাবাকে।

—আশ্চর্য মা-বাপ এদের।

—এদের বাপ-মা মজুরশ্রেণির। জমি নেই, ধান নেই। এই ধানচালের দর, কাজেই ছেলেমেয়েদের খেতে দেবার ক্ষমতা নেই তাদের। এরা ঘুরে ঘুরে নিজেদের খাবার নিজেরা জোগাড় করে—রাত্রে বাড়ি ফিরে শুয়ে থাকে। জানে যে বাড়ি গেলে খেতে পাবে না, বাইরে থেকে যা কিছু জোটে।

বহরাগড়া থেকে ফিরবার পথে মেদিনীপুর জেলা ও বিহারের সিংভূম জেলার সংযোগস্থলে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে এক মৌজাদারের বাড়ি আমরা গিয়েছিলাম। এ গাঁয়ের নিকটেই ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে কাপ্তেন ফার্গুসনের অধীনস্থ ব্রিটিশবাহিনীর সঙ্গে ধলভূমের রাজা জগন্নাথ ধলের যুদ্ধ হয়। তখন মেদিনীপুরের এদিকে ঝাড়খণ্ডের অন্য কোনো স্থানে ব্রিটিশ অধিকার বিস্তৃত হয়নি। এই যুদ্ধের পর রাজা জগন্নাথ ধল পরাজিত হয়ে কালিকাপুরের নিকট জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও ধলভূম ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়।

পূর্বে এখানে ঘন বন ছিল এবং বনের মধ্যেই ধলভূমের রাজার সাঁওতাল যোদ্ধাগণ কাঠের বেড়া ও পরিখা খনন করে ব্রিটিশবাহিনীকে বাধা দেবার আয়োজন করেছিল। এখন সেখান দিয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা চলে গিয়েচে, বন কোনোদিকেই নেই, চাষের মাঠের মধ্যে দু'একটা মহুয়া গাছ আছে এখানে ওখানে। মৌজাদারের উপাধি দণ্ডপাণি। পূর্বপুরুষ উড়িষ্যা থেকে এসে এখানে বাস করেছিলেন। এখন এখানেই বড় চাষিবাসী গৃহস্থ হচ্ছে। বর্তমান খাদ্যসঙ্কটের দিনে পারিবারিক অর্থনীতি কোন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, দণ্ডপাণি মহাশয়ের সংসার ও গৃহস্থালী তার প্রকৃষ্ট আদর্শ। এমন একটি সুস্থ দৃঢ় প্রাচুর্যপূর্ণ গৃহস্থালী আজকাল চাকুরিসর্বস্ব বাংলাদেশে দেখা যায় না। ভূমিহীন চাষজীবী বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবার আজ মরণের পথে পা বাড়িয়েচে, শহরের গলির মধ্যেকার পনেরো-বিশ টাকা মাসিক ভাড়ার আলো-বাতাসহীন কক্ষে অর্ধাশনে বাস করে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করচে—অথচ এই সিংভূম মানভূম অঞ্চলে শত শত বিঘা জমি জঙ্গল হয়ে পড়ে—যেখানেই বেড়াতে গিয়েচি এই কথাটা আগে মনে হয়েচে।[1]*

(ক্রমশ)

[1]এরপর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে রচনাটি অসমাপ্ত থেকে যায়। রচনাটির জেরক্স কপি শ্রীসুমন ভট্টাচার্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত। নতুন পত্র অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩৫০, পর পর দুটি সংখ্যায় এই অসমাপ্ত রচনাটি প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে রুশতী সেন প্রদত্ত বিস্তৃততর তথ্য 'গ্রন্থপরিচয়'-এ দেওয়া হল।নির্বাহী সম্পাদক